SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-3, (Jul-Sep) 2025

বালগঙ্গাধর তিলকের গীতারহস্য ও অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

Dibyendu Chattopadhyay
Research Scholar
Dept. of Sanskrit, Pali & Prakrit
Visva Bharati University
Shantiniketan, West Bengal, India
Email: namastedibyendu@gmail.com

Abstract: মহাভারতের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধক্ষেত্রে বেদনাহত কিংকর্তব্যবিমূঢ় অর্জুনকে ক্ষত্রিয়জনোচিত যুদ্ধকর্মে প্রবৃত্ত করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের অমৃতময়ী বানী ভগবদ্গীতা বিধৃত। জাতি,ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয়দের কাছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পরম সমাদৃত। উপনিষদসাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ ভারতের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতিরূপে বর্ণনা করেছেন। গীতা সেই উপনিষদের সারাংশ ও সর্বজনবোধ্য। শুধু ভারতে নয়, বহির্ভারতেও বহুমনীষী গীতার উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন এবং অতিশ্রদ্ধার সঙ্গে গীতা অনুবাদ করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন এবং নানাভাবে গীতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় মহামনীষী বালগঙ্গাধর তিলকের জীবনে গীতার প্রভাব এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বিশাল গ্রন্থে অনুবাদের বিপুল প্রয়াস। ভারতীয় মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে গীতার প্রভাব ছিল অপরিসীম। আমরা জানি সুভাষ চন্দ্র বোস, ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং এবং অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধার এই গ্রন্থটি অবশ্য পাঠ্য ছিল। গ্রন্থটি তাঁরা সর্বদাই নিজের সঙ্গে রাখতেন। কারণ এই গ্রন্থে ছিল জীবনের শক্তিমন্ত্র।

মনীষী বালগঙ্গাধরের সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ ছিল গীতাগ্রন্থ। মান্দালয় কারাগারে একটি বিভীষিকাময় পরিবেশে তিলক যখন ইংরেজদের হাতে বন্দী ছিলেন তখনই তিনি রচনা করছিলেন কালজয়ী গ্রন্থ গীতারহস্য বা কর্মযোগশাস্ত্র। এই গ্রন্থ রচনাকালে তিনি মূলগীতা বা কোন ভাষ্যই পাননি। সম্পূর্ণ স্মৃতি থেকেই রচনা করেন গ্রন্থটি। তিলকের মতে অধিকাংশ ভাষ্যই একদেশদর্শী। তাই তিনি এরকম একটি ভাষ্যের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন। আজীবন ভারতবর্ষের মুক্তিযোদ্ধা স্বয়ং কর্মযোগী তিলক গীতাকে কর্মযোগের দৃষ্টিতেই ব্যাখ্যা করেন। গীতায় বলা হয়েছে কর্মের গতি কঠিন। শুধু তাই নয় কর্মের বন্ধও কঠিন- 'গহনা কর্মণো গতি:' (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 4/17)। কর্মের রহস্যকে তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মহামান্য তিলক গ্রন্থটি মাহারাষ্ট্রী ভাষায় রচনা করেন। পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এটি বাংলায় অনুবাদ করে অগণিত বঙ্গবাসীকে উপকৃত করেন। এই ভাষ্য রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানবসমাজকে কর্মযোগে উদ্বুদ্ধ করা। এই প্রসঙ্গে তিনি জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের ব্যাখ্যাও করেন এবং সকল পন্থার মধ্যে একটি সমন্বয় সাধনের প্রয়াস করেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সংক্ষেপে তিলকের ব্যাখ্যা ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গীতা রহস্য উদঘাটনের প্রয়াস অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

Keywords: বালগঙ্গাধর তিলক, গীতারহস্য, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কর্মযোগ, মান্দালয় কারাগার।

মহাভারতের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধক্ষেত্রে বেদনাহত কিংকর্তব্যবিমূঢ় অর্জুনকে ক্ষত্রিয়জনোচিত যুদ্ধকর্মে প্রবৃত্ত করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের অমৃতময়ী বানী ভগবদ্গীতা বিধৃত। জাতি,ধর্ম

নির্বিশেষে ভারতীয়দের কাছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পরম সমাদৃত। উপনিষদসাহিত্যে সূক্ষাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব সমাজের সকলের কাছে বোধগম্য হয় না। সেই ক্ষেত্রে উপনিষদের সারমর্ম শ্রীকৃষ্ণ মনোজ্ঞ ভাষায় বিবৃত করে সকলের কাছে উপনিষদেরই তাৎপর্য্যই উদঘাটিত করলেন। উপনিষদসাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ ভারতের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতিরূপে বর্ণনা করেছেন। গীতা সেই উপনিষদের নির্যাস ও সর্বজনবোধ্য। মনীষী সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ সূত্রকারে গীতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বলেছেন— The Gita asks us to work in imitation of the Lord for the purpose of Lokasamgaha or the greatest good of the greatest number – the unification of humanity in universal sympathy. The Gita is designed to provide a solution to all human problems. It reconciles and harmonizes spiritual freedom with work in the world.

শুধু ভারতে নয়, বহির্ভারতেও বহুমনীষী গীতার উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন এবং অতিশ্রদ্ধার সঙ্গে গীতা অনুবাদ করেছেন,ব্যাখ্যা করেছেন এবং নানাভাবে গীতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এর থেকে বোঝা যায় গীতা আমাদের জাতীয় ধর্মগ্রন্থ হলেও ধর্ম শব্দটি সংকীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করা হয়নি। গীতার তুল্য উদার দ্বিতীয় কোন গ্রন্থ নেই। এই উদারতার পরিচয় পাওয়া নিম্নলিখিত শ্লোকে—

"যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্।।"[1]

অর্থাৎ যে ভক্ত যে দেবতার উদ্দ্যেশ্যে ভক্তি সহকারে অর্চ্চনা করতে চাই, আমি সেই দেবতার প্রতি তার ভক্তি জোরদার করি।।

প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় মহামনীষী বালগঙ্গাধর তিলকের জীবনে গীতার প্রভাব এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বিশাল গ্রন্থে অনুবাদের বিপুল প্রয়াস। ভারতীয় মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে গীতার প্রভাব ছিল অপরিসীম। আমরা জানি সুভাষ চন্দ্র বোস, ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং এবং অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধার এই গ্রন্থটি অবশ্য পাঠ্য ছিল। গ্রন্থটি তাঁরা সর্বদাই নিজের সঙ্গে রাখতেন। কারণ এই গ্রন্থে ছিল জীবনের শক্তিমন্ত্র।

ভারতের লোকমান্য মুক্তিযোদ্ধা মনীষী বালগঙ্গাধরের সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ ছিল গীতাগ্রন্থ। মান্দালয় কারাগারে একটি বিভীষিকাময় পরিবশে তিলক যখন ইংরেজদের হাতে বন্দী ছিলেন তখনই তিনি রচনা করছিলেন কালজয়ী গ্রন্থ গীতারহস্য বা কর্মযোগশাস্ত্র। এই গ্রন্থ রচনাকালে তিনি মূলগীতা বা কোন ভাষ্যই পাননি। সম্পূর্ণ স্মৃতি থেকেই রচনা করেন গ্রন্থটি।

ভারতীয় নানা ভাষায় শঙ্করাচার্য থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত গীতার অগণিত ভাষ্য পাওয়া যায়। নানাজনের রচিত গীতার ভাষ্য গ্রন্থটির অত্যন্ত জনপ্রিয়তাই সূচনা করে। তথাপি তিলকের মনে হয়েছিল যে সমস্ত ভাষ্যই একদেশদর্শী। কেউ অদ্বৈতবাদী, কেউ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আবার কেউ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী এইপ্রকারে ভাষ্যগুলি রচিত হয়েছে। এই কারণে তিলক এমন একটি ভাষ্য রচনা করতে প্রবৃত্ত হলেন যেটি গীতাগ্রন্থের একটি বাস্তবিক ও সম্পূর্ণ পরিচয় পাঠকের কাছে তুলে ধরতে পারে। ভাষ্যটি মাহারাষ্ট্রী ভাষায় রচিত হয়েছে। তিলকের পিতার অসুস্থতার সময়ে তিলক তাঁর পিতাকে প্রতিদিন গীতা পাঠ করে শোনাতেন সেই সময়ই গীতার উপর তাঁর বিশেষ আকর্ষণ জন্মাই। পরবর্তীকালে গীতায় তাঁর ধ্যান জ্ঞান হয়ে উঠেছিল।

গীতা এবং উপনিষদ ঠাকুর পরিবারের সকলেরই জীবন গঠনের ভিত্তি। ব্রহ্মনিষ্ঠ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর মেজো দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে মাহারাষ্ট্রী ভাষা শেখে তিলকের নবীন গীতাভাষ্যের অনুবাদ করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষজীবনে গীতা চর্চাতেই নিমগ্ন ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতারহস্যের কিছু অংশ অনুবাদ করে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে সমগ্র গ্রন্থ অনুবাদের জন্য অনুরোধ করেন এবং লোকমান্য তিলকের কাছে অনুবাদ প্রকাশের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিলকের ইচ্ছা ছিল উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা বঙ্গভাষাতেও এর অনুবাদ প্রকাশ করাবেন তাই তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাশয়ের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে পত্র দিলেন। মহামনীষী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে তিলকেরও পত্রালাপ হয়। এই ভাষ্য অনুবাদের ভূমিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন— লোকমান্য মহাত্মা তিলক তাঁহার প্রণীত গীতারহস্য বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধক্রমে বঙ্গবাসীর কল্যানকামনায়, বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে– অতীব দুরূহ ও শ্রমসাধ্য হইলেও আমি এই গুরুভার স্বেচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলাম।ভগবানের কৃপাই এতদিনের পর উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া, আমার এই কঠিন ব্রত উৎযাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি। কেবল একটা আক্ষেপ রহিয়া গেল —এই অনুবাদ গ্রন্থখানি মহাত্মা তিলকের করকমলে স্বহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলাম না। তাহার পূর্বেই তিনি ভারতবাসীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া দিব্যধামে চলিয়া গেলেন। অনুবাদকর্মের শেষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এটি প্রকাশ করেছিলেন। যাইহোক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এটি বাংলায় অনুবাদ করে অগণিত বঙ্গবাসীকে উপকৃত করেন।

মূল অনুবাদের ভাষ্যগ্রন্থের শেষে সমগ্র গীতাটির অনুবাদ এবং রহস্য উদঘাটনের কৃতিত্ব জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষিতিন্দ্রনাথকে অর্পণ করেন। অনুবাদটির বৈশিষ্ঠ হল সর্বদায় দুই বা ততোধিক শ্লোককে একত্রে নিয়ে অনুবাদ করা হয়েছে।

গীতারহস্য গ্রন্থটি পঞ্চদশ প্রকরণে বিভক্ত করা হয়েছে এবং শেষে একটি পরিশিষ্ট প্রকরণও রয়েছে। যথা— বিষয়প্রবেশ, কর্মজিজ্ঞাসা, কর্মযোগশাস্ত্র, আধিভৌতিকসুখবাদ, সুখদুঃখবিবেক, আধিদৈবতপক্ষ–ক্ষেত্র-ক্ষেত্রবিচার, কাপিল সাংখ্যশাস্ত্র অথবা ক্ষর-অক্ষর বিচার, বিশ্বের রচনা ও সংহার, অধ্যাত্ম, কর্মবিপাক ও আত্মস্বাতন্ত্র্য, সন্ন্যাস ও কর্মযোগ, সিদ্ধাবস্থা ও ব্যাবহার, গীতাধ্যায়সঙ্গতি, উপসংহার।

বিষয়প্রবেশ নামক প্রথম প্রকরণে আলোচ্য বিষয় গীতা শব্দের অর্থ,গীতার বর্ণনা, প্রস্থানত্রয়ী ও তার সাম্প্রদায়িক ভাষ্য। শঙ্করাচার্য,রামানুজ, শ্রীধর প্রভৃতির সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি ইত্যাদি এবং তার নিবারণার্থ গীতার উপদেশ। কর্মজিজ্ঞাসা নামক দ্বিতীয় প্রকরণে আমাদের শাস্ত্রকারদের দৃষ্টির উদারতা, মাতা-পিতা প্রভৃতির প্রতি কর্তব্যবোধ, ধর্ম ও অধর্মের সূক্ষ্মতা এবং গীতার অপূর্বতার আলোচনা দেখা যায়। কর্মযোগশাস্ত্র নামক তৃতীয় প্রকরণে গীতার প্রতিপাদ্য কর্মযোগ, ধর্ম শব্দের দুই অর্থ ব্যাবহারিক ও পারলৌকিক ধর্মনির্ণয় ইত্যাদি। আধিভৌতিকসুখবাদ নামক চতুর্থ প্রকরণে প্রতিপাদ্য বিষয় হল আধিভৌতিকসুখবাদ প্রসঙ্গে চার্বাক মত, হবসের মত, কর্ম অপেক্ষা কর্তার বুদ্ধির মহত্ব, পরোপকারের উদ্দ্যেশ্য ইত্যাদি। সুখদুঃখবিবেক নামক পঞ্চম প্রকরণে সুখ দুঃখ বিপর্যয়, দুঃখের আধিক্য, আধ্যাত্মিক সুখের শ্রেষ্ঠতা ও নিত্যতা, সেই প্রসঙ্গে তিনি বহু শাস্ত্রকারদের মতের আলোচনা করেছেন। আধিদৈবতপক্ষ–ক্ষেত্র-ক্ষেত্রবিচার নামক ষষ্ঠ প্রকরণে

কর্মেন্দ্রিয়, মন, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপার, মন-বুদ্ধির কাজ, একই বুদ্ধির সাত্ত্বিক প্রভৃতি ভেদ, ক্ষর এবং অক্ষর বিচারের প্রস্তাবনা আলোচিত হয়েছে।

কাপিল সাংখ্যশাস্ত্র অথবা ক্ষর-অক্ষর বিচার নামক সপ্তম প্রকরণে সাংখ্য শব্দের অর্থ, মোক্ষের আলোচনা, সাংখ্যের পুরুষ এবং বেদান্তের পুরুষ ইত্যাদির আলোচনা দেখা যায়। বিশ্বের রচনা ও সংহার নামক অষ্টম প্রকরণে জ্ঞান বিজ্ঞানের লক্ষণ, সৃষ্টির উৎপত্তিক্রম এবং আধুনিক উৎপত্তিবাদের স্বরূপ প্রভৃতি গূঢ় তত্ত্বের আলোচনা দেখা যায়। দ্বৈতবাদের উৎপত্তি, গীতা এবং উপনিষদ উভয়েরই প্রতিপাদন করে জীব কীপ্রকারে পরমেশ্বরের অংশ হয়, মোক্ষের স্বরূপ ও সিদ্ধি অবস্থার বর্ণনা ইত্যাদি অধ্যাত্ম নামক নবম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। মায়াসৃষ্টি ও ব্রহ্মসৃষ্টি, জ্ঞান শব্দের অর্থ, জ্ঞান বিনা কর্ম থেকে মুক্তি নেই, কর্মক্ষয়ের স্বরূপ, দেবযান, পিতৃযান, জীবনমুক্তির অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা কর্মবিপাক ও আত্মস্বাতন্ত্র্য নামক দশম প্রকরণে আলোচিত হয়েছে। সন্ন্যাস এবং কর্মযোগ নামক একাদশ প্রকরণে সন্ন্যাস শব্দের অর্থ, সন্ন্যাস যোগ এবং কর্ম,যোগের মধ্যে কর্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব, লোকসংগ্রহ এবং তার লক্ষণ, ঈশাবাস্যোপনিষদের মন্ত্রের শঙ্করভাষ্যের বিচার ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। সিদ্ধাবস্থা ও ব্যাবহার নামক দ্বাদশ প্রকরণে স্থিতপ্রজ্ঞ, সমাজের পূর্ণ অবস্থায় কর্মযোগীর স্থিতপ্রজ্ঞের আচরণ জ্ঞানী ব্যক্তির কর্তব্য, লোকসংগ্রহ ও কর্মযোগ, স্বার্থ, পরার্থ ও পরমার্থের আলোচনা দেখা যায়। ভক্তিমার্গ নামক ত্রয়োদশ প্রকরণে ভক্তিমার্গ, গীতা ধর্মে প্রতিপাদিত শ্রদ্ধা এবং জ্ঞানের মিলন, ভক্তি ও কর্মে অবিরোধ, সকল ধর্ম অপেক্ষা গীতাধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। গীতাধ্যায়সঙ্গতি নামক চতুর্দশ প্রকরণে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় সাধন,গীতার শেষে কর্মযোগই প্রতিপাদ্য ইত্যাদি বিষয়ের বিশদ আলোচনা দৃষ্ট হয়। উপসংহার নামক পঞ্চদশ প্রকরণে ইমানুয়েল, কান্ট, গ্রাহাম গ্রিন ইত্যাদি পাশ্চাত্য মনীষীদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সহিত গীতার সাম্য নিরূপণ, কর্মযোগে কলিযুগীয় সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, এই প্রসঙ্গে জৈন, বৌদ্ধ,ভগবদ্ভক্ত, রামদাস প্রভৃতির কথা আলোচনা, গীতা ধর্মের নিত্যতা ও সমতা আলোচিত হয়েছে।

গীতারহস্য গ্রন্থটি কর্মযোগ গ্রন্থ নামে পরিচিত। আজীবন ভারতবর্ষের মুক্তিযোদ্ধা স্বয়ং কর্মযোগী তিলক গীতাকে কর্মযোগের দৃষ্টিতেই ব্যাখ্যা করেন। গীতায় বলা হয়েছে কর্মের গতি কঠিন। শুধু তাই নয় কর্মের বন্ধও কঠিন— 'गहना कर्मणो गतिः'[2]। কর্মের রহস্যকে তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিলকের দৃষ্টিতে গীতাই কর্মযোগের প্রাধান্য। ভগবান অর্জুনকে সর্বতোভাবে বুঝিয়েছেন যে জ্ঞান ও ভক্তি, কর্মের পরিপন্থী নয়, পরন্তু কর্মের পরিপোষক ও সহায়।জ্ঞান ও ভক্তি কর্মে গিয়ে পরিসমাপ্তি হয় ও পরিণতি লাভ করে। গীতায় জ্ঞানমূলক ভক্তিপ্রধান কর্মযোগের প্রতিপাদন করা হয়েছে। তিলকের মতে মানুষ কখনো কর্ম থেকে মুক্ত হতে পারে না। সেজন্য নিবৃত্তিমার্গ গীতার মার্গ নয়, কর্মমার্গই গীতার মার্গ।

তিলক জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের ব্যাখ্যাও করেন এবং সকল পন্থার মধ্যে একটি সমন্বয় সাধনের প্রয়াস করেন। অর্জুনকে যুদ্ধকার্যে প্রবৃত্ত করাই হল শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। মহামান্য তিলক মনে করতেন গীতায় যোগ শব্দের অর্থ হল কর্ম। যোগী এবং কর্মযোগী দুটি শব্দই গীতায় সমানার্থক এবং এর অর্থ হল যে ব্যক্তি যুক্তি বা বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করেন। মহাভারত এবং গীতায় 'কর্মযোগ' শব্দটি যেহেতু বড় তাই ছোট 'যোগ' শব্দটি বেশী ব্যবহৃত হয়েছে। মহাভারতে যোগ শব্দ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— 'प्रवृत्तिलक्षणो योगः ज्ञानं सन्यासलक्षणम्।' জনক প্রভৃতি রাজারা কর্মের দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত করেছেন। জনকের

দেখানো পথের নাম যোগ। তাই গীতার যোগ শব্দটিকেও একই অর্থ দিতে হবে। কারণ গীতায় জনকের পথের কথা বলা হয়েছে—

"कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः।
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि।। "[3]

মানুষের জীবন নির্বাহের অনাদিকাল থেকে দুটি মার্গ চলে আসছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

"लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ।
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्।। "[4]

অর্থাৎ হে নিষ্পাপ অর্জুন! আমি জ্ঞান অর্জনের দুটি পথের বর্ণনা করেছি। জ্ঞানযোগ হল সেই সমস্ত মানুষের জন্য যারা দার্শনিক আলোচনায় আগ্রহী এবং কর্মযোগ হল সেই সমস্ত মানুষের জন্য যারা কর্মে আগ্রহী। প্রথম মার্গকে সাংখ্য বা সাংখ্যনিষ্ঠ বলে দ্বিতীয়টিকে কর্মযোগ বা যোগ বলে। এই উভয় মার্গের মধ্যে কর্মযোগ শ্রেয়—

"सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ।
तयोस्तु कर्मसन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते।।"[5]

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্য এবং যোগের কথা উল্লেখ করেছেন। সে সম্বন্ধে তিলক বলেছেন যে আচার্য কপিল প্রাচীন বেদান্তের সিদ্ধান্তকে কিছু পরিবর্তন ও সংস্কারসাধন করে সাংখ্যশাস্ত্র রচনা করেন—

"इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः।
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते।।"[6]

উপরি উক্ত মতের বিশদে ব্যাখ্যা করেছেন শ্লোক উদ্ধৃতি দিয়ে দিয়ে। যেমন—

"परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात् सनातनः।
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति।।"[7]

লোকমান্য তিলক বৈদিক বাঙ্ময়, জ্যোতিষ, সাহিত্য এবং পুরাতত্ত্ব শাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। গীতারহস্য গ্রন্থে বালগঙ্গাধর তিলকের অপরিসীম পাণ্ডিত্য ব্যক্ত হয়েছে। কারাগারে থাকাকালীন যখন গ্রন্থটি রচনা করেছেন তখন তাঁর কাছে স্মৃতিসাহায্যকারী কোন পুস্তকই ছিল না। তথাপি তিনি বহু ভাষ্যের, পাশ্চাত্য পণ্ডিত এবং মীমাংসক প্রভৃতি নানা শাস্ত্রকারদের মত নিজের স্মৃতি থেকে তিনি এই গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁদের মতকে যেখানে প্রয়োজন সেখানে খণ্ডনও করেছেন। তিলকের আলোচনায় বিপুল ভারতীয় শাস্ত্রের যে বিচরণ তা বাস্তবিকই অত্যন্ত বিস্ময়কর। সত্যিই ধন্য তাঁর স্মৃতিশক্তি! ধন্য তাঁর প্রতিভা।

Endnotes

1. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা. জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ,21
2. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, জ্ঞানযোগ-17
3. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, কর্মযোগ -20
4. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, কর্মযোগ -3
5. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, কর্মসন্ন্যাস যোগ-2
6. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ-19
7. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, অক্ষরব্রহ্মযোগ -20

Bibliography

- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা রহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র (বালগঙ্গাধর তিলক)- জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রোগেসিভ বুক ফোরাম, ৩৩কলেজ রোড, কলিকাতা-৯, অষ্টম সংস্করণ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ।
- শ্রীমদ্ভগবগীতা-স্বামী জগদীশ্বরানন্দ- উদ্বোধন কার্যালয়-১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, নবম সংস্করণ-জানুয়ারি, ২০১৯
- শ্রীমদ্ভগবগীতা- শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা ৭০০০০৩, নবম সংস্করণ ২০১৯
- গীতা-পাঠ - দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, ৪ নং এগলিন রোড, কলকাতা-20, মার্চ ১৯৭৩
- গীতায় আত্মসঞ্চালন ও মহাভারতঃ একটি নিবিড় পাঠ- লোকনাথ চক্রবর্তী ও শিউলি বসু, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, প্রকাশকাল- জুলাই, ২০১৯/এ
- শ্রীমদ্ভগবগীতা-মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, দেব সাহিত্য কুটীর প্রইভেট লিমিটেড, ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ডিসেম্বর ২০১৯

——